আজকের কাগজ

তারিখ 17 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধে করণীয় কি?

কে, এম, সোবহান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে ভাব রয়েছে। সকলের মনেই একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কর্মকৎপরতা স্থগিত রাখা হয়েছে। কর্মতৎপরতা স্থগিত করা এবং সন্ত্রাস বন্ধ এক নয়। এটা অন্তত দেখা যাচ্ছে যে ছাত্রদলের কর্মতৎপরতা স্থগিত করার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ হয়েছে। এতে আপাতঃদৃষ্টিতে সন্ত্রাসের সঙ্গে ছাত্রদলের একটা যোগাযোগ আছে এটাই প্রমাণ করে। বিএনপি মহলে বলা হচ্ছে নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সন্ত্রাস আরম্ভ হবে না এটাই ছাত্রছাত্রী তাদের অভিভাবকদের এবং নাগরিকদের আশা। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের কাজটি প্রকৃত ছাত্রদের কাছে ছেড়ে দিলেই বিষয়টি অনেক সরল হয়ে যাবে। যারা প্রকৃত ছাত্র তারা যদি নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্ব স্থির করে তাহলেই ছাত্রদলের নেতৃত্ব ছাত্রদেরই হাতে থাকবে। তার সঙ্গে আরও দু' একটি শর্ত থাকা প্রয়োজন। প্রথম শর্ত নেতৃত্বে যারা আসবে তাদের কোন মতেই একটা সীমিত বয়সের বেশী হওয়া উচিৎ নয়। আর একটি শর্ত থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে যে ছাত্র একবার মাষ্টার্স ডিগ্রী করার পর যদি অন্য কোন বিষয়ে ছাত্রাবস্থায় ফিরে আসে ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্ব করার জন্য তাকে ছাত্র রাজনীতির জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগ ইতিপূর্বেই বয়স সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বলে শোনা যায়। এতে নাকি সুফলও হয়েছে। ইদানিং দেখা গেছে ছাত্রলীগ (মন্টু গ্রুপ নয়) কোনরকম হানাহানিতে অংশ নিচ্ছে না তাদের নেতারা অনেক সময় লাঞ্ছিত হলেও তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছে না।

নির্বাচনের বিকল্প নেই তা সে যে নির্বাচনই হোক না কেন। ছাত্র নেতৃত্ব স্থির হয় প্রধানতঃ দলীয় নেতার ইচ্ছানুযায়ী যেটা কোনক্রমেই বাঞ্চণীয় নয়। অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় পাকিস্তানে ২৩ বছরে কোন সাধারণ নির্বাচন হয়নি যার ফলে সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ছিল না। এই জন্য ওখানকার রাজনীতি কলুষিত হয়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণ জড়িত ছিল না। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের ৭৩-এর পর থেকে ৯১ পর্যন্ত কোন সুস্থ ও অবাধ নির্বাচন না হওয়ার ফলে সরকার পরিচালনা থেকে জনগণের অবস্থান ছিল অনেক দূরে। সেই কারণেই সরকার হয়ে উঠেছিল একনায়কত্বের উপর নির্ভরশীল। এক নায়ক স্বৈরাচার হতে বাধ্য। সেখানে রাষ্ট্রশাসিত হয় ব্যক্তি দ্বারা আইনের দ্বারা নয়। বর্তমান সরকার একটি নির্বাচিত সরকার এবং সংসদীয় শাসন পদ্ধতি চালু হয়েছে কাজেই নির্বাচনের উপর সরকারী দলকে আস্থাশীল হতে হবে। সরকার নির্বাচিত হলে সরকারী দলের আবার আচরণ দলের মধ্যে এবং দলের বাইরে গণতান্ত্রিক এটা ঠিক বলা যাবে না। সরকারী দল পরিচালিত হচ্ছে একজন ব্যক্তির নির্দেশে এ রকম অবস্থায় যদি সেই ব্যক্তির কোন ভুলভ্রান্তি হয় তাহলে সেই ভুল ভ্রান্তির প্রতিক্রিয়া হবে কেবল দলের পরই নয় তার প্রতিক্রিয়া সারাদেশেরই উপর হবে। নেতৃত্ব যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে তাহলে তা কালক্রমে স্বৈরশাসনে পর্যবসিত হতে বাধ্য।

যে কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল করে দেয়া হলো তার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক ছাত্র দলেটরা নির্বাচিত করেছিল। সে নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে বিরোধী গ্রুপ অনশন আরম্ভ করে। কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রীদের আশ্বাসে তারা অনশন ভঙ্গ করলেও সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা বন্ধ এবং কমিটির অপর সকল সদস্যকে নিজেদের গ্রুপ মনোনীত করে। তার পিছনেও কয়েকজন মন্ত্রী ও নেতাদের সমর্থন ছিল। এক কমিটিতে দু'টি বিপরীতমুখী গ্রুপ থাকার কারণেই ঐ রক্তারক্তি সংঘর্ষ ঘটে। কমিটি বাতিল করা হয়েছে ছাত্রদলের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। তিনি অস্ত্র জমা দেয়ার বা উদ্ধার করার কোন নির্দেশ দিয়েছেন বলে কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। খবরে প্রকাশ পুলিশ ৫টি হলে তল্লাশি চালিয়েও কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। তল্লাশির সময় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তবে তারা কেউই ছাত্র নয়। তারা ক্যান্টিনে কর্মরত শ্রমজীবী। এদের গ্রেপ্তারের পিছনে কি যুক্তি আছে তা পুলিশই বলতে পারে। অস্ত্র উদ্ধার না করার অর্থ হচ্ছে অস্ত্র ব্যবহারকারীরা যথা সময়ে ওগুলো আবার ব্যবহার করবে। অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখার নিরাপদ স্থানও অস্ত্রধারীরা জানে যেখানে পুলিশ পৌছাতে পারে না। এর থেকে এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে সন্ত্রাস সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে মাত্র। সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির এত দাপটের কি কারণ। কারণ যথেষ্ট আছে যা সরকারী দল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অজানা নয়। ডাকসুর যে নির্বাচন হয় তা অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় তবে তা যে অবাধ হয় না এ সম্বন্ধে অনেকেই নিশ্চিত। ডাকসুর নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রগোষ্ঠিগুলো নিজেদের দলের প্রার্থীদের জয়ের জন্য সাধারণ ছাত্রদের দ্বারস্থ হতে হয় ভোটের জন্য। সাধারণ ছাত্ররা অবাধে ভোট দিতে পারে না কেননা সরকারী দলের ছাত্রগোষ্ঠি তা সে যে সরকারী দলই হোক না কেন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে ভোটারদের উপর। সরকারী ছাত্রগোষ্ঠির বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। শোনা যায় যে ছাত্র নেতাদের ভর্তির ব্যাপারে কোটা দিয়ে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। তারপর আসে হলে সিট পাওয়ার ব্যাপার। মফস্বল থেকে আগত ছাত্র বা সাধারণত মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের হওয়ার ফলে বাইরে থেকে পড়া চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব কাজেই তারা ছাত্রনেতাদের শরণাপন্ন হয় হলে সিট পাওয়ার ব্যাপারে। এখানেও শোনা যায় যে ছাত্রনেতাদের কোটা আছে। এবং হল কর্তপক্ষকে ছাত্রনেতাদের কথা রাখতে হয়। বিশেষ করে এই দুটি কারণে নবাগত ছাত্ররা কৃতজ্ঞ থাকে প্রভাবশালী ছাত্রনেতা এবং তাদের দলের কাছে।

এরপর আছে ছাত্রনামধারী ছাত্রনেতাদের বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জন। একশ্রেণীর ছাত্রনেতা আছে যারা ছাত্রদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অন্য কোন একটি বিষয়ে ভর্তি হয়ে ছাত্রাবস্থা বর্ধিত করে। এ সুযোগ যদিও বর্তমানে অনেক সংকীর্ণ হয়ে এসেছে তবুও একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে তা বলা চলে না। দীর্ঘ সময় যারা ছাত্র থাকে তাদের কর্মজীবন পিছিয়ে গেলেও অর্থের কোন অভাব দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদাররা গত প্রায় ১৫/১৬ বছর ধরে অভিযোগ করে আসছেন যে কোন কোন নেতা কর্মীকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে ঠিকাদারী করা যায় না। বর্তমানে সবকিছুর মত এই অবস্থারও অবনতি হয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদাররা অভিযোগ করেছেন যে টেন্ডারের ধার্য টাকার ২৫ শতাংশ কমিশন ছাত্রনেতা ও কর্মীদের না দিলে তাঁরা কাজ করতে পারবেন না। ২৫ শতাংশ কমিশন দিয়ে তাঁদের বিশেষ লাভ না থাকায় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নিতে আগ্রহী নন। কয়েকমাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোর কিছু সংস্কার করা হয়েছে ঠিকাদাররা বলেছেন এর জন্য ছাত্রনেতা কর্মীদের লাভের একটি মোটা অংশ দিতে হয়েছে। এই টাকা শোনা যায় যে ছাত্রনেতা উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে এবং নিজস্ব কর্মীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে বাধ্য হয় দলীয় সমর্থনের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশও জড়িত থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে। শিক্ষকরা সচেতন নাগরিক হিসেবে অবশ্যই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকবেন। শিক্ষকরা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা উপদেষ্টাও হতে পারেন এবং এতে রাজনীতির তাত্বিক ক্ষেত্র যুক্তিবাদী হবে এবং গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে উদারতা আসবে যদি সেই শিক্ষক গণতান্ত্রিক দলের সমর্থক হন। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ করে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তা থেকে প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত অনেকে এবং সাধারণ শিক্ষকরা মৌলবাদী-ফ্যাসিবাদী দলের সমর্থক এবং তাঁরা তাঁদের দলের

নির্বাচনের বিকল্প নেই তা সে যে নির্বাচনই হোক না কেন। ছাত্র নেতৃত্ব স্থির হয় প্রধানতঃ দলীয় নেতার ইচ্ছানুযায়ী যেটা কোনক্রমেই বাঞ্চণীয় নয়। অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় পাকিস্তানে ২৩ বছরে কোন সাধারণ নির্বাচন হয়নি যার ফলে সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ছিল না। এই জন্য ওখানকার রাজনীতি কলুষিত হয়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণ জড়িত ছিল না। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের ৭৩—এর পর থেকে ৯১ পর্যন্ত কোন সুস্থ ও অবাধ নির্বাচন না হওয়ার ফলে সরকার পরিচালনা থেকে জনগণের অবস্থান ছিল অনেক দূরে। সেই কারণেই সরকার হয়ে উঠেছিল একনায়কত্বের উপর নির্ভরশীল। এক নায়ক স্বৈরাচার হতে বাধ্য।

আজকের কাগজ

তারিখ ... 17 SEP 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

110—B

ফ্যাসিবাদী ছাত্রদের সরাসরি সাহায্য করেন যার ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুটোতে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া একেবারেই নেই। ছাত্রদের মধ্যে যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে চায় না তারাও নিরাপত্তার জন্য এবং নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করার জন্য বাধ্য হয় এই ফ্যাসিবাদী–মৌলবাদী দলের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক রাখতে। যাঁরা দলীয় রাজনীতি সমর্থক বা দলে সক্রিয় অংশ নেন তাঁরা নিশ্চয়ই পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের কর্তব্য পালনে দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত না হতে। বিষয়টি একটু কঠিন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষে তা অসম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসে প্রধানতঃ লেখাপড়া করতে এবং তার সাথে তারা দলীয় রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়ে। এটা স্বাভাবিক তবে এই কারণে ঐ বিশেষ মতাবলম্বী শিক্ষকদের এদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে শিক্ষকদের সম্মানহানি ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে একজনের যা দায়িত্ব এবং কর্তব্য তার সাথে দলীয় রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। এই দুইটি বিষয় পৃথকীকরণে শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষকরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সকল নির্বাচনের মত এ নির্বাচনও যে অবাধ হওয়া বাঞ্ছনীয় এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এইসব নির্বাচনে সেইসব শিক্ষকদের নির্বাচন করা প্রয়োজন যাঁরা ঐ সংস্থায় শ্রেষ্ঠ অবদান রাখতে পারবেন। এখানেও দলীয় স্বার্থ এবং সংস্থার স্বার্থকে পৃথক রাখতে হবে এবং সেখানেই শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিক্ষক প্রার্থীরা কোন একটি প্যানেলভুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ভোটার এবং ছাত্ররা জানে কোন প্যানেলের কি রাজনৈতিক মতাদর্শ। শিক্ষকরা নির্বাচনের জন্য অহেতুক দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন এবং এতে নিজেদের মধ্যেও বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হয়। যে সব সংস্থার জন্য তারা নির্বাচনে যান সেগুলো একান্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক। সেখানে কি প্রয়োজন আছে দলীয় পরিচয়ে প্রতিনিধিত্ব করার। না সেখানে এ ধরনের অবকাশ থাকা উচিত। এই নির্বাচনে শোনা যায় শিক্ষকরা তাঁদের দলীয় ছাত্রদেরও সাহায্য নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। সাধারণ মানুষ মনে করে এইভাবে দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন এবং তার জন্য দলীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হওয়া এবং ছাত্রদের সাহায্য শিক্ষকদের শুধু সম্মানহানিকরই নয় এতে তাঁদের নিজস্ব দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনেও বাধা সৃষ্টি করে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি সন্ত্রাসমুক্ত করতে হয় তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও সরকারী দলকে শুরু করতে হবে নিজের ঘর পরিষ্কার করা থেকে। সেই সঙ্গে অপর অপর দল যাদের ছাত্র সংগঠন আছে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচী নিতে হবে। একদলের সন্ত্রাসীরা (যাদের ক্যাডার বলা হয়) তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে কিন্তু অন্য দলের ক্যাডাররা নির্ভাবনায় থাকবে তাহলে সন্ত্রাস দূর হবে না। এতদিন এটাই হয়ে এসেছে এবং এর জন্য সব রাজনৈতিক দলকেই কোন না কোন সময় মাশুল দিতে হয়েছে। ক্যাডারদের তা তারা যে দলভুক্তই হোক না কেন নিজেদের মধ্যে তাদের নিজস্ব পেশার কারণে একটা অলিখিত সমঝোতা থাকে যার ফলে একদল থেকে বহিষ্কৃত হলে অপর দলের সমর্থন তাৎক্ষণিকভাবেই পাওয়া যায়।

এই অবস্থার অবসানের জন্য অবিলম্বে সরকারী এবং বিরোধী দলের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে সুদৃঢ় প্রসারী পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশে সন্ত্রাস যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে দেশের স্থিতিশীলতা এবং গণমানুষের নিরাপত্তার জন্য দলের উর্ধ্বে উঠে কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সন্ত্রাস দমনে।

কে, এম, সোবহানঃ কলাম লেখক, প্রাক্তন বিচারপতি।